বঙ্গবন্ধুর কৃষি দর্শন ও দেখানো পথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অর্জন

মোঃ ইসমাইল হোসেন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। এ দেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, সামাজিক রীতিনীতি এবং জীবনধারা কৃষি কেন্দ্রিক। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬০-৭০ শতাংশ মানুষ এখনো গ্রামে বাস করে। বাংলাদেশের জাতিয় আয়ের ১৩.৫০ শতাংশ অর্জিত হচ্ছে কৃষি খাত থেকে। এখনও দেশের ৪১ শতাংশ মানুষ কর্মসংস্থানের জন্য কৃষি নির্ভর। কৃষি বাংলাদেশের ১৬.৫০ কোটি মানুষের খাদ্য ও পুষ্টির নিশ্চয়তা বিধান করার পাশাপাশি বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামালের সরবরাহ নিশ্চিত করছে। ভবিষ্যতেও কৃষি খাত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

১৯৭১ সালে ৯ মাস ব্যাপি রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অনেক ত্যাগ, তিতিক্ষা ও ধ্বংসের মাধ্যমে অর্জিত সোনালী ফসল আমাদের প্রিয় জন্মভূমি স্বাধীন বাংলাদেশ। পাকিস্তানী স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে সমগ্র মুক্তিকামী জনতাকে নের্তৃত্ব দিয়েছিলেন যে মহানায়ক তিনি হলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন প্রকৃত কৃষক ও শ্রমিক প্রেমিক সিংহ হৃদয়ের অধিকারী নেতা। দেশের সুবিধাবঞ্চিত কৃষক ও শ্রমিকদের ভাগ্যন্নোয়নের প্রতি তিনি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছিলেন। পাকিস্তানের কারাগার থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করেই তিনি যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশ গঠনের প্রতি মনযোগি হন। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত একটি সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু সর্বদা হৃদয়ে লালন করতেন। একইসাথে তিনি উপলব্ধি করতেন যে, কৃষি ও কৃষকের সামগ্রিক উন্নতি ছাড়া ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত একটি সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। অথচ কৃষকরাই হলো দেশের বঞ্চিত জনগোষ্ঠী যাদের প্রতি সর্বাগ্রে মনোযোগ ও গুরুত্ব দেয়া আবশ্যক। স্বাধীন বাংলাদেশে সরকার গঠনের পর পরই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু সবুজ বিপ্লবের ডাক দেন। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ১৩ জানুয়ারি মন্ত্রি পরিষদের প্রথম বৈঠকেই কৃষকদের জন্য বঙ্গবন্ধু এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু কৃষকদের সব বকেয়া খাজনার সুদ মওকুফ করে দেন। তিনি ২৫ বিঘা পর্যন্ত খাজনাও মওকুফ করার ঘোষণা দেন। তিনি কৃষি বিপ্লব বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি যুগোপযোগী ভূমি সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির বিশেষ আদেশে পরিবার প্রতি জমির মালিকানা ৩৭৫ বিঘা থেকে কমিয়ে ১০০ বিঘায় নামিয়ে আনা হয়। উদ্বৃত্ত জমি ও খাস জমি ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের মধ্যে বণ্টনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সমবায় পদ্ধতিতে কৃষকদের মাঝে জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির ১৩৫ নম্বর আদেশের মাধ্যমে নদী কিংবা সাগর গর্ভে জেগে ওঠা চরের জমির মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে নিয়ে হতদরিদ্র কৃষকদের মধ্যে বন্টনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি শাসনমলে রুজু করা ১০ লাখ সার্টিফিকেট মামলা থেকে কৃষকদের মুক্তিদানসহ সব বকেয়া ঋণ মওকুফ করে দেন। বঙ্গবন্ধুর এ চিন্তাধারায় কৃষকদের জন্য অকৃত্তিম ভালোবাসার প্রমাণ মেলে নয় মাস মাসব্যাপী একটি রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতা দিবসে তাঁর প্রদত্ত বক্তব্যে। বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতা দিবসে তিনি বলেন:

> ‘আমাদের চাষী হলো সবচেয়ে দুঃখী ও নির্যাতিত এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য আমাদের উদ্যোগের বিরাট অংশ অবশ্যই তাদের পেছনে নিয়োজিত করতে হবে।’

কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নের স্বার্থে দেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বঙ্গবন্ধু বিচক্ষনতার সাথে সমবায়কে অন্যতম কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন । এলক্ষ্যে তিঁনি প্রবর্তন করেছিলেন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি কুমিল্লা উদ্ভাবিত দুই স্তর বিশিষ্ট নতুন সমবায় ব্যবস্থা। পল্লী উন্নয়ন একাডেমি কুমিল্লা পরবর্তীতে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড-এ রূপান্তরিত হয়। একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে দেশের উত্তরাঞ্চলে গ্রামীণ উন্নয়নের প্রশিক্ষণ ও গবেষণার জন্য বঙ্গবন্ধু গড়ে তোলেন বগুড়া একাডেমি, যা পরবর্তীতে পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া নামে রূপান্তরিত হয়। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ এক জনসভায় প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু গ্রাম ভিত্তিক কৃষি সমবায়ের রূপরেখা বর্ণনা করেন। তিঁনি বলেন, ‘গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। ভুল করবেন না। আমি আপনাদের জমি নেব না। ভয় পাবেন না যে, জমি নিয়ে যাব তা নয়। পাঁচ বছরের প্ল্যানে- এ বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামে কো-অপারেটিভ হবে। প্রত্যেকটি গ্রামে এ কো-অপারেটিভ; এ জমির মালিকের জমি থাকবে; কিন্তু তার যে অংশ বেকার, যে মানুষ কাজ করতে পারে তাকে কো-অপারেটিভের সদস্য হতে হবে। এগুলো বহুমুখী কো-অপারেটিভ হবে। পয়সা যাবে তাদের কাছে, ফার্টিলাইজার যাবে তাদের কাছে, টেস্টরিলিফ যাবে তাদের কাছে, ওয়ার্কস প্রোগ্রাম যাবে তাদের কাছে, আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিল টাউটদের বিদায় দেয়া হবে। তা না হলে দেশকে বাঁচানো যাবে না। এজন্যই ভিলেজ কো-অপারেটিভ হবে। আমি ঘোষণা করছি, ৫ বছরের প্ল্যানে প্রত্যেকটি গ্রামে পাঁচশ থেকে হাজার ফ্যামিলি পর্যন্ত নিয়ে কম্পলসারি কো-অপারেটিভ হবে। আপনার জমির ফসল আপনি নেবেন, অংশ যাবে কো-অপারেটিভের হাতে, অংশ যাবে গভর্নমেন্টের হাতে।’ গ্রামভিত্তিক কৃষি সমবায়ের রূপরেখার বিষয়ে তিঁনি আরও বলেন, ‘রাষ্ট্র তোমাকে ঋণ দেবে, টাকা দেবে, ইনপুটস দেবে, তোমাকে সেচের ব্যবস্থা করে দেবে। সেটা করে দেবে তুমি যদি এ ধরনের সমবায় কর। সমবায়ের ফলে যে উৎপাদনশীলতা বাড়বে তার সুফলটা যেমন পাবে জমির মালিক, তেমনি এটার অংশ পাবে যারা ভূমিহীন কৃষক, যারা ওখানে শ্রম দেবে তারা। যারা এখানে বিনিয়োগ করবে, তারাও এখানকার একটা অংশ পাবে।’ কৃষি বিপ্লব সফল করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর পরিকল্পনা ছিল গ্রামভিত্তিক বহুমুখী কৃষি সমবায় গড়ে তোলা। তিঁনি বিশ্বাস করতেন কৃষকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত আবাদী জমি একীভূত করে যৌথ কৃষি খামার গড়ে তোলার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। সমবায় পদ্ধতিতে দেশের সকল মানুষকে কাজে লাগাতে হবে। সমবায়ে অংশগ্রহণকারী সকলেই উৎপাদনের হিস্যা পাবে। তবে জমির মালিকানা জমির প্রকৃত মালিকেরই থাকবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতিতে এক জনসভায় বক্তব্য রাখেন। ঐ সভায় তিনি কৃষি বিপ্লবের ডাক দেন। কৃষি বিপ্লব সফল করার লক্ষ্যে তিনি কৃষকদের নিবেদিতভাবে কাজ করে যাওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান। সভায় তিনি বলেন: 'বাংলাদেশের এক ইঞ্চি পরিমাণ জমিও অনাবাদি রাখা যাবে না।' কৃষি বিপ্লবের মাধ্যমে তার স্বপ্নের 'সোনারবাংলা' গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকলকে কাজ করার জন্য বঙ্গবন্ধু আহ্বান জানান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিদেশ থেকে সাহায্য বা ভিক্ষা করে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের পরিবর্তে দেশের জনশক্তি ও সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ভিক্ষুক হিসেবে বিশ্বে পরিচিত না হয়ে সম্মানের সাথে মাথা উঁচু করে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর এই স্বপ্ন ও প্রত্যয়ের প্রমাণ মেলে ১৯৭২ সালের ৫ এপ্রিল বাংলাদেশ বেতারে প্রদত্ত এক বক্তৃতায়। বক্তৃতায় তিনি বলেন, 'আজকে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। সেজন্য কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন রয়েছে। ...আমরা কলোনি ছিলাম পাকিস্তানিদের। আমাদের যা কিছু করতে হবে, সবকিছু বিদেশ থেকে আনতে হবে। কোথায় পাবেন বিদেশি মুদ্রা? দু'হাতে কাজ করতে হবে; ইনকাম করতে হবে। স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। যে মানুষ ভিক্ষা করে তার যেমন ইজ্জত থাকে না, যে জাতি ভিক্ষা করে তারও ইজ্জত থাকে না। ভিক্ষুকের জাতিকে প্রশ্ন করতে আমি চাই না। আমি চাই আমার দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হোক এবং সেজন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।' বঙ্গভবনে ১৯৭৫ সালের ২১ জুলাই নবনিযুক্ত জেলা গভর্নরদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধুর তাঁর ভাষণে স্বনির্ভর কর্মসূচি'র উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, 'যেখানে খাল কাটলে পানি হবে, সেখানে সেচের পানি দিন। সেই পানি দিয়ে ফসল ফলান। মোরালাইজ দি পিপল। পাম্প যদি পাওয়া যায়, ভালো। যদি না পাওয়া যায়, তবে স্বনির্ভর হন। বাঁধ বেঁধে পানি আটকান, সেই পানি দিয়ে ফসল ফলান। আমাদের দেশে আগে কি পাম্প ছিল? দরকার হয় কুয়া কেটে পানি আনুন। আমাদের দেশে পাঁচ হাত, সাত হাত, আট হাত কাটলেই পানি ওঠে। সেখানে অসুবিধা কী আছে? যে দেশে পানি আটকে রাখলে পানি থাকে, সেখানে ফসল করার জন্য চিন্তার কী আছে?'

বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বক্তব্যে কৃষিবিদ ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'শুধু কাগজে-কলমে আর বই পড়েই কৃষি কাজ হয়না। ছোট ভাইয়েরা তোমরা মনে কিছু করবে না। বই পড়ে তোমরা যা শেখ, গ্রামে যারা অর্থাৎ বুড়ো কৃষক, নিজের অভিজ্ঞতায় কম শেখে না। যদি তাদের জিজ্ঞেস করো এ জমিতে কী লাগবে, কতটুকু সার লাগবে, সে নির্ভুল বলে দিতে পারবে। তোমরা পাঁচ বছরে বই পড়ে যা শিখবে না, তার কাছে দেখো উত্তর সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবে। বইয়ের সঙ্গে সঙ্গে একটু প্র্যাকটিক্যাল কাজ করতে হবে। প্যান্ট-শার্ট-কোট একটু খুলতে হবে। তা নাহলে কৃষি বিপ্লব করা যাবে না। বাংলাদেশে প্যান্ট-শার্ট-কোট ছেড়ে মাঠে না নামলে বিপ্লব করা যাবে না, তা যতই লেখাপড়া করা যাক, কোনো লাভ হবে না। আপনাদের কোট-প্যান্ট খুলে একটু গ্রামে নামতে হবে। গ্রামে যেয়ে আমার চাষি ভাইদের সঙ্গে বসে প্র্যাকটিক্যাল কাজ শিখতে হবে।' বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তব্যে আরও বলেন, 'খাদ্য বলতে শুধু ধান, চাল, আটা, ময়দা আর ভুট্টাকে বোঝায় না বরং মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, শাক-সবজি এসবকে বোঝায়। সুতরাং কৃষি উন্নতি করতে হলে এসব খাদ্য শস্যের উৎপাদনে উন্নতি করতে হবে।' কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সোনার বাংলা গড়ে তালার আন্দোলনে কৃষিবিদদের উৎসাহিত ও নিবেদিত করার লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণির মর্যাদা দান করেন।

দেশের জন্য দ্রুত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু দেশের স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদদের নিয়ে ১৯৭২ সনের ৩১ জানুয়ারি গঠন করেন প্রথম পরিকল্পনা কমিশন। বঙ্গবন্ধুর শাসন আমলেই শুরু হয় কৃষির প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে তিনি বেশ কয়েকটি কৃষি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, ইক্ষু গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনসহ অনেক প্রতিষ্ঠানই তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। সোনালি আঁশের অপার সম্ভাবনার বিস্তার লাভের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠা করেন পাট মন্ত্রণালয়। বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগ ও নেতৃত্বে পুনর্গঠন করা হয় যে সকল প্রতিষ্ঠান তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বিএডিসি, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, রাবার কার্যক্রম, হর্টিকালচার বোর্ড ইত্যাদি। পুনর্গঠিত বিএডিসির মাধ্যমে দেশব্যাপি বীজ ও সার সরবরাহ ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালে বিশেষ উদ্যোগ ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ছোট বা ক্ষুদ্র কৃষকের স্বার্থ সংহত করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু সমবায় ভিত্তিক চাষবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করেন যে, কৃষি ভিত্তিক বহুবিধ সংস্কার ও প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠাই যথেষ্ঠ নয়। লক্ষ্য অর্জনের জন্য কৃষকদের অনুকূলে অর্থ সরবরাহ প্রয়োজন। অর্থাভাবে কৃষি উৎপাদন অব্যাহত রাখা কৃষকদের পক্ষে সম্ভব নয়। এলক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে মাহামান্য রাষ্ট্রপতির ২৭ নম্বর অধ্যাদেশ বলে বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক। পরবর্তীতে ১৯৮৭ সালে তদানিন্তন সরকার বর্তমান রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের দায় ও সম্পদ নিয়ে পৃথক ব্যাংক হিসেবে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে। রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক হলো দেশের একমাত্র ব্যাংক যার প্রধান কার্যালয় রাজধানী ঢাকার বাহিরে রাজশাহীতে অবস্থিত। সর্বোপরি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি ও কৃষকদের উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ১৯ এপ্রিল কৃষক লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। সার্বিক বিষয় বিবেচনা করলে দেখা যায় মাত্র মাত্র তিন বছরে বঙ্গবন্ধু যে সমস্ত কৃষিভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ, প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও সংস্কার এবং কৃষি দর্শন ধারণ করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন যা আজ ২০২১ সালেও আধুনিক কৃষি হিসেবেই বিবেচিত হচ্ছে। আজ তিনি বেঁচে থাকলে অনেক আগেই আমাদের বাংলাদেশ সোনার বাংলায় রূপান্তরিত হতো যা সম্প্রতি তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাত্র কয়েক বছরে বাস্তবায়নে সক্ষম হয়েছেন।

বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ ও দর্শন ধারণ করে কৃষি ও কৃষকের সার্বিক উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তার উপর সর্বাগ্রে গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অগ্রাধিকার কর্মসূচি গ্রহণ করেন। ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত মাত্র পাঁচ বছরে অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অর্জিত হয় চমকপ্রদ সাফল্য। প্রথমবারের মতো দেশ খাদ্যে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করে। ১৯৯৬ সালের পূর্বে বাংলাদেশ কখনই খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। ২০০১ সালের নির্বাচনের পূর্বে দেশে ৪০ লাখ টন খাদ্য উদ্বৃত্ত হয়। তাঁর অবদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা কর্তৃক 'সেরেস' পদকে ভূষিত হন। পরের দুই মেয়াদের সরকার কৃষি খাতের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান না করার কারণে দেশে পুনরায় খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়। তৎপ্রেক্ষিতে খাদ্য আমদানি নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়। প্রয়োজনীয় সরকারী কর্মসূচি ও সহায়তার অভাবে কৃষকরা বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কৃষকদের কোন দাবি-দাওয়ার প্রতি ন্যূন্যতম গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি। বরং সারের দাবীতে আন্দোলনরত কৃষকদের বুলেটের আঘাতে প্রাণ দিতে হয়েছে।

২০০৮ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দ্বিতীয় দফায় সরকার গঠিত হলে আবারও কৃষি ও কৃষকের সুদিন ফিরে আসে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার কৃষকদের সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সব উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। সাম্প্রতিক সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কিছু মন্তব্যে কৃষি ও কৃষকের প্রতি তাঁর অদম্য ভালোবাসার বর্হিপ্রকাশ মেলে। তাঁর এ সকল মন্তব্য বঙ্গবন্ধুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আমরা মানতে বাধ্য হই –যোগ্য পিতার যোগ্য কন্যা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্য সত্যিই জাতিকে আশান্বিত করে। কৃষি ও কৃষক সম্পর্কে তাঁর কিছু মন্তব্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

‘সরকারের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে কৃষকদের অধিকার রক্ষা করা। কারণ, খাদ্য ও পুষ্টি সরবরাহ করে কৃষিই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে।
‘সরকার বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও শিল্পোন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার পথে কৃষি ও কৃষকদের পেছনে ফেলে রাখবে না।’
‘আমরা উন্নত হব, তবে আমরা আমাদের কৃষক ও কৃষিকে বাদ না দিয়ে আমরা শিল্পোন্নত হয়ে উঠব।’

অতি সম্প্রতি ‘বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস’ উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘মহান স্বাধীনতা অর্জনের পর হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর পুনরায় কৃষির উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন শুরু করে। ফলে আধুনিক কৃষিতে যোগ হয়েছে উচ্চফলনশীল জাতের ফসল, যা অত্যন্ত কার্যকরী।’ এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাণীতে আরও বলেন, ‘প্রযুক্তি যাতে মাটির জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকি না হয়, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। মাটির স্বাস্থ্যের সঙ্গে মানবস্বাস্থ্যের সম্পর্ক নিবিড়। নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন টেকসই মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা। বাংলাদেশের কৃষি এখন খরপোশ কৃষি থেকে বাণিজ্যিক কৃষিতে উত্তরণের ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি উৎপাদিত কৃষি পণ্যের গুণাগুণ বজায় রাখতে হবে।’ প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘কৃষির আধুনিকায়নের ফলে কৃষি উপকরণ হিসেবে বাড়ছে বিভিন্ন ধরনের সার ও বালাইনাশকের ব্যবহার। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে এরই মধ্যে কৃষি সেক্টরে যোগ হচ্ছে নতুন নতুন উচ্চমূল্যমানের ফসল। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য বাড়ছে ফসল নিবিড়তা।’

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শাসনামলে (২০০৮-২০০৯ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত) কৃষি, কৃষক এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য বহুবিধ কর্মসূচি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি ও পদক্ষেপসমূহ হলো কৃষি খাতের উন্নয়নে সাশ্রয়ী মূল্যে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান; জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সেচ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে কৃষি জমির আওতা সম্প্রসারণ; কৃষকদের ডাটাবেজ তৈরীকরণ; কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান; শস্য বহুমুখীকরণ; কৃষি পণ্যের প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাতের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিকরণ; কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান; কৃষি গবেষণার মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার সহজলভ্যতা; বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য উপযুক্ত কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন; কৃষি গবেষণার জন্য এনডাউমেন্ট ফান্ড মঞ্জুর; উৎপাদন বৃদ্ধি ও মাটির স্বাস্থ্য রক্ষার্থে জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধি; পুকুর-খাল ভরাট বন্ধে কঠোর অবস্থান নেয়া; নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নদী খনন ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি; জাতীয় মাছ ইলিশ রক্ষা কার্যক্রম; কৃষি ঋণ প্রাপ্তি সহজীকরণ; পশু সম্পদ উন্নয়ন নীতি; মৎস্য নীতি; কৃষি উপকরণ নীতি; কৃষি সম্প্রসারণ নীতি; জাতীয় কৃষি নীতি; এক জমিতে চার ফসল ভিত্তিক ফসলধারা ইত্যাদি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শাসনামলে কৃষি খাতে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ধানের উৎপাদন ৩ কোটি ৮৭ লাখ টন ছাড়িয়ে গেছে। গম ১২ লাখ টন, ভুট্টা ৫২ লাখ টন এবং আলু উৎপাদন হচ্ছে ১ কোটি ৫ লাখ টন। ডাল, শাক-সবজি, ফলমূল, তেল ইত্যাদি ফসলের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ বিশ্বে ধান উৎপাদনে সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়াকে পেছনে ফেলে তৃতীয়, আম উৎপাদনে সপ্তম, আলু ও পেয়ারা উৎপাদনে অষ্টম এবং সবজি উৎপাদনে তৃতীয় স্থান অর্জনকারী দেশ। এছাড়া প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য খাতে সরকার কর্তৃক গৃহিত বিভিন্ন গবেষণা ও আর্থিক প্রণোদনামূলক কর্মসূচির কারণে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বর্তমানে মিঠা পানির মৎস্য উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়। সর্বোপরি ব্যাংক ঋণের সুদহার সর্বোচ্চ ৯% ও পরবর্তীতে ৮% এবং আমানতের সুদহার সর্বোচ্চ ৬% নির্ধারণ বর্তমান সরকারের অন্যতম বিনিয়োগ বান্ধব একটি পদক্ষেপ। উল্লিখিত কর্মসূচিসমূহের পাশাপাশি সরকার কর্তৃক গৃহিত পদক্ষেপের মধ্যে রেয়াতি সুদে কৃষি ঋণ প্রদান, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের আওতায় কৃষকদের ১০ টাকার আমানত হিসাব খোলা ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদান, কটেজ ও মাইক্রো উদ্যোগকে SME-এ অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা, নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির অংশ হিসেবে নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ প্রদান ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমানের সাথে তুলনা করলে দেশে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে তিন গুণের অধিক। এছাড়া গমের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে দ্বিগুণ, সবজি পাঁচ গুণ এবং ভুট্টার দশ গুণ। চা উৎপাদনও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। সিলেট ও চট্টগ্রাম ছাড়াও পঞ্চগড়ে উন্নত মানের চা উৎপাদিত হচ্ছে। দশ থেকে বিশ বছর পূর্বেও দেশের অধিকাংশ জমিই ছিল এক ফসলী। বর্তমানে সকল অঞ্চলের জমিতে বছরে দুটি ফসলে উৎপাদিত হচ্ছে। সরকারের উপরোল্লিখিত সময়পোযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, কৃষকদের ঐকান্তিক পরিশ্রম ও অভিজ্ঞতা এবং কৃষি বিজ্ঞানীদের গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত ফসলের নতুন জাত ও বহুবিধ প্রযুক্তি, সময় মতো সার, কীটনাশক, সেচ ও বিদ্যুৎ সরবরাহ এ সাফল্য অর্জনে মূল ভূমিকা পালন করেছে। আর এ সব কিছুর নেতৃত্বে রয়েছেন মাননীয় প্রদানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। স্বাধীনতার পর দেশে প্রতি হেক্টর জমিতে দুই টন চাল উৎপাদিত হতো। হেক্টর প্রতি ১০.৩৪ টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করে বিশ্বে বাংলাদেশের উপরের অবস্থানে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। অপরদিকে, বাংলাদেশের পরে যথাক্রমে আর্জেন্টিনা, চীন ও ব্রাজিলের অবস্থান। আমরা এখন গর্বের সাথে বলতে পারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বে প্রধান খাদ্যশস্য উৎপাদনের কাতারে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দেশের তালিকায় উঠে এসেছে বাংলাদেশ। কৃষি উৎপাদনে এ সাফল্য এত সহজে অর্জিত হয়নি। এলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে, মেধা, মনন ও প্রজ্ঞা ব্যয় করতে হয়েছে, দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। সর্বোপরি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কৃষি দর্শন ও ভাবনা অনুসরণ করতে হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথেই এ সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এদেশে প্রতিবছর মানুষ বেড়েছে অথচ কমেছে ফসলি জমি। পরিসংখ্যান থেকে জানাগেছে, প্রতিবছর বাংলাদেশে ২০ থেকে ২২ লাখ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপরদিকে প্রতিবছর নানা কারণে ৮ লক্ষ হেক্টর আবাদী জমি হ্রাস পাচ্ছে। বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বর্তমান সরকার কৃষি খাতের আধুনিকায়নে সর্বদা তৎপর রয়েছে। সীমিত পরিমাণ জমিতে চাহিদা মোতাবেক ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনমতো বীজ, সার, কীটনাশক ও সেচ সরবরাহ, উন্নত ও আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতির প্রয়োগ, কৃষকদের প্রশিক্ষণ, দুর্যোগ মোকাবলা, ফসলের নতুন জাত

উদ্ভাবনে সরকারকে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়েছে । বর্তমানে উন্নত কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার সহজলভ্য করা হয়েছে। আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে কৃষকেরা জমি চাষ, সার দেয়া, ফসল রোপন ও মাড়াই করা করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরকার সাধারণ মানুষ ও বেকার যুব শক্তিকে কৃষিমুখী করার লক্ষ্যে নানাবিধ প্রণোদনাসহ বহুবিধ সফল উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এতদপ্রেক্ষিতে আবাদী জমির পরিমাণ হ্রাস পেলেও শস্য উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। একইসাথে কৃষি জমি রক্ষার স্বার্থে ভবন ও স্থাপনা হরাইজন্টালি স্থাপন বা সম্প্রসারণের পরিবর্তে ভার্টিক্যালি স্থাপন বা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। এখন বঙ্গবন্ধুর কৃষি দর্শন ও সোনার বাংলার স্বপ্ন সম্পূর্ণ প্রায়। আজ বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। । মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পেরেছেন সাধারণ মানুষ ও কৃষকের মুখে হাসি ফোটাতে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ সফলতা অর্জন করেছে। এমডিজি'র আটটি লক্ষ্যের প্রতিটিতে বাংলাদেশের অর্জন সন্তোষজনক। বাংলাদেশ ৩৩টি উপসূচকের মধ্যে ১৩টি সম্পূর্ণভাবে অর্জনে সমর্থ হয়েছে। এমডিজির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান লক্ষ্য দারিদ্র্য বিমোচন যা অর্জিত হয়েছে। এ ছাড়া শিক্ষা, লিঙ্গবৈষম্য, শিশুমৃত্যু, মাতৃস্বাস্থ্য, রোগবালাই নিয়ন্ত্রণে রাখা, টেকসই পরিবেশ ইত্যাদি মূল লক্ষ্যের অধিকাংশ উপসূচকে লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে। বাংলাদেশ এখন নিম্ন আয়ের দেশের তালিকা থেকে বেরিয়ে এসে মধ্যম আয়ের দেশের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। এখন আমরা সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এডিজি) অর্জনের প্রত্যাশায় রয়েছি। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দেশগুলোর অগ্রগতি যাচাই প্রতিবেদন মোতাবেক বিশ্বের ১৬৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১০৯তম। প্রতিবেদন অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়ার ৪২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান পঞ্চম । এছাড়া বাংলাদেশের অবস্থান ভারত, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের উপরে। কভিড-১৯ মহামারীর পরিস্থিতির কারণে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এতদপ্রেক্ষিতে এসডিজি কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হওয়ায় বাস্তবায়ন কিছুটা বিলম্বিত হতে পারে। তথাপি আমরা বিশ্বাস করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এসডিজ'র সকল লক্ষ্য অর্জিত হবে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে আমরা উন্নত বিশ্বের কাতারে প্রবেশ করতে সমর্থ হবো।

বিগত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের মার্চ মাস থেকে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর বৈশ্বিক মহামারীর কারণে সমগ্র বিশ্বের অর্থনীতি ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। সরকার এ অবস্থা থেকে জনগণ তথা দেশকে সুরক্ষার জন্য সাধারণ ছুটিসহ নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করে। করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর প্রাদুর্ভাবের কারণে সরকার কর্তৃক গৃহিত আর্থিক কার্যক্রমের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ উল্লেখযোগ্য:

(১) প্রাথমিক পর্যায়ে ০১ (এক) লক্ষ ০৩ (তিন) হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা;
(২) ৩১ মার্চ ২০২০ তারিখ ভিত্তিক ঋণের এপ্রিল-মে ২০২০ মাসের সুদ আংশিক মওকুফ;
(৩) ব্যাংকসমূহের এডিআর ও সিআরআর এর নির্ণায়ক পুন:বিন্যাস;
(৪) ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত কোন ঋণ নতুনভাবে শ্রেণীকরণ না করা;
(৫) রেয়াতি সুদে শস্য খাতে ঋণ বিতরণ ইত্যাদি।

উল্লিখিত টাকার প্রণোদনা প্যাকেজের মধ্যে কৃষি খাতে চলতি পুঁজির জন্য ৫ (পাঁচ) হাজার কোটি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এ প্যাকেজের আওতায় ৪% সুদে কৃষকদের মাঝে ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। এছাড়া শস্য উৎপাদনের জন্য রেয়াতি ৪% সুদে ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। করোনা ভাইরাসের ক্রান্তিকালে অর্থাভাবে যেন কোন কৃষকের উৎপাদন ব্যাহত না হয় সে লক্ষ্যে সরকার সহজ শর্তে এ ঋণ প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ফলশ্রুতিতে উৎপাদন ব্যাহত হয়নি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করোনার প্রাদুর্ভাবকালীন সময়ে উৎপাদনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তন্মধ্যে কৃষি উৎপাদনের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেন। করোনায় বিশ্বের প্রায় সকল দেশ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এ ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে দীর্ঘ সময় লাগবে। বিশেষ করে বিশ্বে খাদ্য ঘাটতি দেখা দিবে এবং বিশ্বব্যাপি কোটি কোটি মানুষ অনাহারে মৃত্যুবরণের সম্ভাবনা রয়েছে। যে সকল দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকবে সেকল দেশ দ্রুত ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ দূরদর্শিতা ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত বাংলাদেশকে করোনার মরণ ছোবলের কারণে অর্থনৈতিক ধ্বস থেকে বহুলাংশে রক্ষা করেছে। দেশে খাদ্যাভাব বা দূর্ভিক্ষ দেখা দেয়নি। বরং করোনার মধ্যেও এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অর্জিত হয়েছে ৫.২৪ জিডিপি যা সমগ্র বিশ্বকে করেছে বিস্মিত। আজ বাংলাদেশ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'আমরা কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করেছি, যা বিশ্ব সম্প্রদায়ের নজর কেড়েছে। এমনকি মহামারি কোভিড-১৯ দুর্যোগের মধ্যেও বাংলাদেশের কৃষি নিরবচ্ছিন্নভাবে এদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য যোগানের পাশাপাশি অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।'

অতিসম্প্রতি ২৮.০৪.২০২১ তারিখে এডিবি'র ফ্ল্যাগশিপ অর্থনৈতিক প্রকাশনা 'এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট আউটলুক (এডিও)২০২১' প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে বলা হয় বিশ্ব অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার এবং করোনার টিকা প্রদানে অগ্রগতির কারণে চলতি বছরে ঘুরে দাঁড়াবে এশিয়ার অর্থনীতি। প্রতিবেদনে বাংলাদেশ সম্পর্কে বলা হয়েছে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত প্রণোদনার সুফলের কারণে করোনার প্রভাব কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়াবে বাংলাদেশের অর্থনীতি। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে চলতি ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এদেশের প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে ৬.৮% এবং আগামী ২০২১-২০২২ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৭.২% এ উন্নীত হবে। প্রতিবেদন অনুযায়ী করোনার প্রাদুর্ভাব কাটিয়ে উঠতে এশিয়ার অনেক দেশের চেয়ে ভাল সাফল্য অর্জন করেছে বাংলাদেশ। ইতোমধ্যে বাংলাদেশে রফতানি ও রেমিট্যান্স বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া সরকারি বিনিয়োগের পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগও বৃদ্ধি পেয়েছে। এডিবি'র আলোচ্য প্রতিবেদন তথা পূর্বাভাস থেকে অনুমান করা যায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যোগ্য নেতৃত্ব ও তত্বাবধানে করোনার মরণ ছোবলকে ম্লান করে দিয়ে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ।

কৃষি খাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ ঈর্ষণীয় সাফল্য ও অর্জনে সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক অন্যতম। এ ব্যাংক কৃষি ভিত্তিক একটি বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল তথা রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে শস্য উৎপাদনসহ যাবতীয় কৃষি ভিত্তিক কর্মকান্ড, ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠায় অর্থায়ন করে থাকে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন সরকারের ১৯৯৬-১৯৯৭ অর্থবছর হতে ২০০০-২০০১ অর্থবছর মেয়াদকালে রাকাব কৃষিভিত্তিক একটি বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে রাকাব কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ১৪৭৫.৩৮ কোটি টাকা এবং সুবিধাভোগীর সংখ্যা ১০৫৪৫১১ জন। অপরদিকে ২০০৯-২০১০ অর্থবছর হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ৩৬৮৭০.২৮ কোটি টাকা এবং সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২১৭৯৭১৫ জন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নের্তৃত্বাধীন সরকারের মেয়াদকালে মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ৩৮৩৪৫.৬৬ কোটি টাকা এবং মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৩২৩৪২২৬ জন। আলোচ্য সময়কালে খাতভিত্তিক ঋণ বিতরণের মধ্যে শস্য খাতে ৭৭৬৪.০৯ কোটি টাকা; মৎস্য চাষে ২৪৪.৭৩ কোটি টাকা; প্রাণি সম্পদ খাতে ৮৫৫.৬৩ কোটি টাকা; কৃষি ও সেচযন্ত্র খাতে ৫৫.৫২ কোটি টাকা; কৃষি ভিত্তিক শিল্প খাতে ২৪৭.২৫ কোটি টাকা; কৃষি পন্য প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাত খাতে ৪৯৬৫.০৩ কোটি টাকা; সিএমএসএমই খাতে ১৯৬৫.৯৬ কোটি টাকা; দারিদ্র বিমোচন খাতে ৩৩৪.০৯ কোটি টাকা এবং অন্যান্য খাতে ১৯০৯.২৬ কোটি ঋণ প্রদান করা হয়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন সরকারের মেয়াদকালে রাকাব কর্তৃক ২৩৭৭ জন নারী উদ্যোক্তাকে মোট ৫৪.৬৬ কোটি টাকা; ৮৯০৫৬ জন ভূমিহীন ও বর্গাচাষীর অনুকূলে ৩৬০.৯৩ কোটি টাকা; ৯৭৪ জন মুক্তিযোদ্ধার অনুকূলে ৯.৯৫কোটি টাকা; ১০০৬৫ জন ১০ টাকার হিসাবধারীর অনুকূলে ৩২.৩৮ কোটি টাকা এবং ৬৪৮০৩ জন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অনুকূলে দারিদ্র্য বিমোচন খাতে ৩৩৪.০৯ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ব্যাংকের নিজস্ব ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় একাধিক কর্মসূচি ও ভাতা প্রদানের কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন সরকারের মেয়াদকালে ২২১২১৯০ জনকে ৮৯৫.৫৯ কোটি টাকা বয়স্ক ভাতা; ১০৫৫৬৬১ জনকে ৫২০.৫৯ কোটি টাকা বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা ভাতা; ৪৩৫০২১ জনকে ৩০৫.০২ কোটি টাকা অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান করা হয়েছে। উপরিল্লিখিত কার্যক্রম ছাড়াও রাকাব কর্তৃক ক্ষুদ্র কৃষক ও ব্যবসায়ীদের ১০ টাকার সঞ্চয়ী হিসাব এবং স্কুল ব্যাংকিংয়ের আওতায় ছাত্র-ছাত্রীদের সঞ্চয়ী হিসাব খোলা হয়ে থাকে। এযাবত রাকাব কর্তৃক ১৪ লক্ষ ক্ষুদ্র কৃষক ও ব্যবসায়ীদের ১০ টাকার সঞ্চয়ী এবং স্কুল ব্যাংকিংয়ের অওতায় ১ লক্ষ ১৩ হাজার সঞ্চয়ী আমানত হিসাব খোলা হয়েছে। সর্বোপরি করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর বৈশ্বিক মহামারীর কারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ২০২১ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত কৃষি খাতে চলতিপুঁজিতে এ ব্যাংক কর্তৃক ৯১৫৪ জন ঋণগ্রহীতার অনুকূলে ৪১৫.৬৭ কোটি টাকা, এসএমই খাতে ১৩৫৭ জন উদ্যোক্তার অনুকূলে ৫০.১৭ কোটি টাকা, শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরে ৫ জন উদ্যোক্তার অনুকূলে ৫.১০ কোটি টাকা এবং ৪% রেয়াতি সুদে ৯০৭৩২ জন কৃষকের অনুকূলে ৭৬৪.৭৪ কোটি টাকা শস্য ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ব্যাংক কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কৃষকদের অনুকূলে মোট ১৮৫০ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এপ্রিল মাস পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে কৃষিতে চলতি পুঁজি খাতে প্রণোদনা প্যাকেজ ব্যতিত ১৫৫২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে যা মোট লক্ষ্যমাত্রার ৮৪%। অপরদিকে ব্যাংকের মোট ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা ২৮৫০ কোটি টাকা যার ৮৪% এপ্রিল মাসের মধ্যে অর্জিত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও তাঁর স্মৃতি চির স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে ২০১৮ সালে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক প্রধান কার্যালয় ভবনে ‘বঙ্গবন্ধু অঙ্গন’ স্থাপন করা হয়। বঙ্গবন্ধু অঙ্গনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জীবনকালের কর্মকান্ড এবং মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বিভিন্ন ছবি, বই এবং তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এছাড়া মুজিব জন্মশতবার্ষিকীতে গৃহীত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় চত্তরে ২০২০ সালের মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপন করা হয়েছে। দেশের সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আবশ্যিক। কারণ, তাঁর অবদান শোধ করার সক্ষমতা কারোরই নেই।

পরিশেষে কবি জীবনানন্দ দাশের মাতা কবি কুসুম কুমারী দাশের ‘আদর্শ ছেলে’ কবিতাটির প্রথম দুইটি লাইন মনে পড়ছে। তিনি লিখেছিলেন :
‘আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে?’

আমাদের দেশে সেই ছেলে জন্মেছিল ১৯২০ সালে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায়। তিঁনি আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি কথায় নয় বরং কাজে বড় ছিলেন। তিনি আমাদের মহানায়ক, হাজার বছরের শেষ্ঠ বাঙ্গালি। ঘাতকদের নির্মমতা তাঁর ও স্বজনদের প্রাণ কেড়ে নিলেও আল্লাহর মেহেরবানিতে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখন বেঁচে আছেন। বাবার কৃষি দর্শন ও দেখানো পথে তিঁনি উন্নয়নের পথ ধরে অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন বাংলাদেশকে। যোগ্য পিতার যোগ্য কন্যা, আপনি দীর্ঘজীবী হউন এবং আপনার নেতৃত্বে Vision-41 অর্জিত হোক। বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ একটি উন্নত রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করুক।

****